লালনের ভাব-ভাবনায় চৈতন্যদেবের প্রভাব

ড. সত্যরঞ্জন বিশ্বাস

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে (আনুমানিক ১১৮১ বঙ্গাব্দে) বাউল সাধক কবি লালন সাঁই বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি উপজেলার ভাঁড়ারা গ্রামে এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পদবি ছিল কর। গোত্র — ঘৃত-কেশরী। পিতা মাধবচন্দ্র ও মাতা পদ্মাবতী। ম. মনিরউজ্জামান জানিয়েছেন, 'লালনের পূর্ব-পুরুষদের বাসস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার পানিহাটীতে। নবাব আলিবর্দীর সময়ে বর্গী হাঙ্গামা শুরু হলে লালনের পিতামহ চাপড়া গ্রামে অন্যান্য সঙ্গী পরিজনের সাথে এসে বসবাস শুরু করেন। লালনের পিতামহের এক পুত্রের নাম মাধবচন্দ্র কর। মাধব করের দুই পুত্র। একজন ললিত নারায়ণ কর, অন্যজন রামকৃষ্ণ কর। ললিত নারায়ণই পরবর্তীকালে লালন ফকির নামে পরিচিত হন। ললিত নারায়ণ নিঃসন্তান। কিন্তু রামকৃষ্ণের ছিল এক পুত্র এক কন্যা। পুত্রের নাম গোবিন্দ চন্দ্র কর। গোবিন্দ করের তিন পুত্র ও এক কন্যা। তিনপুত্রের নাম কেদারনাথ কর, হারানচন্দ্র কর ও প্রফুল্লকুমার কর। বসন্তকুমার পালও এই গোবিন্দ কর এবং প্রফুল্ল করের নাম উল্লেখ করেছেন। গোবিন্দ কর ও তার পুত্ররা যে এক সময় চাপড়া – ভাঁড়ারা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এর প্রমাণ পাওয়া যায় জমি জমার রেকর্ডে তাঁদের নামভুক্তি দেখে।' (লালন ফকিরের গান, ১ম খণ্ড - ম. মনিরউজ্জামান)।

বসন্তকুমার পালের মতে, লালনের মাতা পদ্মাবতীর রাধামণি ও নারায়ণী নামে দুই বোন ছিল। নারায়ণীর পুত্র আনন্দচন্দ্র ভৌমিক। লালনের মৃত্যুকালে (১২৯৭ বঙ্গাব্দ) আনন্দ ভৌমিক জীবিত ছিলেন। আনন্দ এবং তার পিতা অক্রুর ভৌমিক ছিলেন তখন চাপড়া ভাড়ারা এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে পরিচিত। এই ভৌমিকদের সঙ্গে আত্মীয়তার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে 'হিতকরী'র সম্পাদকীয় নিবন্ধ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের বিবরণ, বসন্তকুমার পাল ও অন্যান্য গবেষকদের তথ্যে। লালন নামটি ছদ্মনাম। আর ডাক নাম ছিল লালু। অল্প বয়সে বিয়ে করলেও তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। যৌবনে সঙ্গীদের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে গিয়ে বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গীরা তাকে ফেলে পালিয়ে আসে। ছেউড়িয়ার মলম কারিকরের স্ত্রী তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে সেবাযত্নে সুস্থ করে তোলেন। ঘটনাক্রমে হরিশপুরের সিরাজ সাঁই নামে এক সাধক ফকির প্রথমে কুষ্টিয়া অঞ্চলে ? পরে মলম কারিকরের বাড়িতে আসেন। তাঁর কবিরাজি চিকিৎসায় লালন পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু একটা চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। এদিকে তার তীর্থভ্রমণের সঙ্গীরা গ্রামে ফিরে এসে লালনের মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দেয়। বেশ কিছুদিন পর লালন স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু মুসলমানের গৃহে অন্নগ্রহণ করার হিন্দু সমাজ তাঁকে ঠাঁই দিতে অস্বীকার করে। তিনি আবার ফিরে যান মলম কারিকরের কাছে। মলম কারিকরের নির্দেশ মতো হরিশপুরের সিরাজ সাঁই-এর কাছে ফকিরী মতে দীক্ষিত হয়ে ধর্মগতভাবে মুসলমান হন। কিন্তু ইসলামি শরিয়তি বিধান তিনি মানতেন না। সিরাজ সাঁই-এর মৃত্যুর পর মলম কারিকর প্রদত্ত জমিতে

আখড়া তৈরি করে তিনি তাঁর রচিত গানের মাধ্যমে ফকিরী মত প্রচার করতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে তা একটি মরমি দর্শন হয়ে ওঠে।

ফকির লালন শাহ একটি দর্শনের নির্মাতা। তিনি ছিলেন মূলত তত্ত্ব ও দর্শনপ্রিয় সাধক কবি। লালন সম্পর্কে পল্লিকবি জসিমউদ্দীন বলেছেন — 'লালন শাহ ছিলেন তত্ত্বসাধক। তত্ত্বকথা শ্রবণ, তত্ত্বসার গ্রহণ এবং তত্ত্ব বিষয়ক চিন্তাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। দীর্ঘ অধ্যাত্ম সাধনায় তাঁর হৃদয়ে যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছিল, তা প্রকাশ করার জন্য তিনি সুর ও ছন্দ অবলম্বন করেন। এ কারণেই তাকে তাত্ত্বিক কবি বলা হয়েছে। তত্ত্ব যার আসল, কবিত্ব সেই তত্ত্ব-কথার বাহন মাত্র।' তত্ত্বজ্ঞ লালন ছিলেন আত্মদর্শী। তিনি বিশ্বাস করতেন, যে তার নাফস্ বা আত্মাকে চিনল সে তার মালিককে চিনল। এই আত্ম-আবিষ্কারই প্রেমতত্ত্ব বুঝে নেবার উপায়। 'আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে / দিব্যজ্ঞানী সেই হয়েছে।' এই দিব্যজ্ঞান থেকেই লাভ করা যায় মহাজ্ঞান। জগতের প্রায় সব ভাবদার্শনিকেরা আত্মতত্ত্বে বিভোর ছিলেন। তাঁদের মর্মে লেগেছিল মরমিতত্ত্বের প্রবল তরঙ্গ। সক্রেটিস, পোলেনিয়া, ব্লেক, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, সানায়ী, রুমি, হাফিজ সাদী, আলফেসানী, ফরিদউদ্দিন আত্তার, মঈনুদ্দিন চিশতি, আমির খশরু, নিজামউদ্দিন প্রমুখ ভাবদার্শনিকেরা তত্ত্বানুসন্ধানীর শিরোপা লাভ করেছেন।

ষোড়শ শতকের মানবতাবাদের উদ্গাতা শ্রী চৈতন্যদেব বৈষ্ণব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রেম-তত্ত্বের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছিলেন। শুদ্ধভক্তি থেকেই প্রেমের উৎপত্তি। প্রেমতত্ত্বের সঙ্গে আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ আত্মদর্শনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ভক্তিতত্ত্বে আত্মনিবেদন আত্মদর্শনের একটি পর্যায়। চৈতন্যদেব বৈষ্ণবতত্ত্বে আত্মনিবেদনের বিষয়টিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর তিনি আত্মমগ্ন ছিলেন। ভক্তিযোগে নিবিষ্ট ছিলেন। এই শুদ্ধভক্তি সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে বলেছেন —

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষ্মণ।।
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন।।
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে ইহা লক্ষণ কয়।।

জ্ঞান নয় কর্ম নয় শুধু ঈশ্বরের জন্য আকুলতা, ঈশ্বরের বিরহে অস্থিরতা, ঈশ্বরকে প্রিয়জনের মতো ভালোবাসা একটি আবেগ - আন্দোলিত মানসিকতায় ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনই হলো ভক্তির লক্ষ্মণ। এই ভক্তি দেখা দিয়েছিল আলোয়ারদের জীবনে-কর্মে- সাধনায়। এঁরা ঈশ্বরের প্রেমে নিমজ্জিত সর্বক্ষণ। নৃত্য-গীত-বাদ্যে কবিতায় এই অধীর প্রেম প্রকাশিত হয়েছে। লালনের সাধনক্ষেত্রেও এর পরিপূর্ণ প্রচ্ছায়া লক্ষিত হয়েছে।

একটা প্রশ্ন থেকে যায়, মানুষতত্ত্বে বিশ্বাসী লালন কেন পৌরাণিক কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা গৌরাঙ্গদের ভগবৎ ভাবনাকে আত্মস্থ করলেন? এর কারণ হল, তাঁদের ব্যক্তিজীবন এবং

সমাজজীবনে পরিস্থিতি প্রতিবেশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্যযুক্ত। বিশেষ করে ভাব - সাধনার গভীরে দুজনেই আকণ্ঠ মগ্ন ছিলেন এবং মানব ভজনার নিরিখে দুজনেই সম - পথগামী। দুজনের মধ্যে সাদৃশ্যের বিষয়গুলি আর একটু গভীরে গিয়ে সন্ধান করে দেখা যেতে পারে।

বেদ-বেদান্ত - বেদাঙ্গ - ব্রাহ্মণ - বৈষ্ণব ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্মবাদের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের গণ্ডি অতিক্রম করে মহাপ্রভু সংস্কার - আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবতাকে অস্বীকার করেছিলেন। লালনও তসবি জপা ফকিরী ছাঁদ বদলে দিয়ে প্রথাবদ্ধ বিধিমার্গী সাধনপন্থার খোল-নলচে পাল্টে দেহসম্ভূত ভাবসাধনাকে অঙ্গীবদ্ধ করেছিলেন।

জাতি ধর্ম-বর্ণ বিন্যাস মানতেন না দুজনেই। নারী, পুরুষ, উচ্চ-নীচ, উচ্চবর্ণ-অন্ত্যজ সমস্ত কিছু তুচ্ছ হয়েছে মানবধর্মের কাছে। গৌরাঙ্গের প্রেমসর্বস্ব বৈষ্ণবধর্মে এবং লালনের উদারবাদী মানবধর্মে সবাই একইভাবে স্থান পেয়েছে।

সমস্ত শ্রেণির সমস্ত বর্ণের মানুষ যে ধর্মে অবলীলায় উন্মুক্ত আসন লাভ করে তাকে বলা হয় গৌণধর্ম। বৃহত্তর নদিয়ায় অনেক গৌণধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। চৈতন্যদেব ও লালন দুজনেই গৌণধর্মে আস্থাশীল ছিলেন। বিশেষ করে যারা অন্ত্যজ শূদ্র, রক্ষণশীল বৈদিক ব্রাহ্মণদের কাছে ব্রাত্য কিংবা অন্যান্য ধর্মেও যারা অবহেলিত তাদের সৃষ্ট গৌণধর্মকে দুজনেই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সাহেবধনী, বলহাড়ি, কর্তাভজা তার দৃষ্টান্ত।

দুজনেই দুটি বিশেষ দর্শনের নির্মাতা। ফলে ধর্মীয় সংস্কারের গণ্ডিবদ্ধতায় তারা আবদ্ধ নন। দর্শন সার্বিক, শাশ্বত, যুগাতীত এবং একক। তাই মহাপ্রভুর বৈষ্ণব-দর্শন এবং লালনের বাউল-দর্শন কিছুটা একই গোত্রভুক্ত।

রাধা-কৃষ্ণকে আমরা নিষ্কাম প্রেমের সৃষ্টিহীন দ্বিত্ব-তত্ত্বমূর্তি বলে জানি। দেহ সঙ্গমে রজ-বীর্যের সন্নিকর্ষ নেই। তাই এই প্রেমের সাধক থাকেন নিঃসন্তান। চৈতন্য ও লালন দুজনেই এই কায়াসাধনায় সিদ্ধপুরুষ।

দুজনেই ছিলেন ভাবলোকে বিচরণকারী। চৈতন্য ভাব-বিহ্বল ভাবে মাতোয়ারা, বস্তুজ্ঞানশূন্য আর লালন ভাব-পাগল। তার ভাবের উৎসারণ গানের মধ্য দিয়ে পরমপুরুষের অন্বেষণে।

মধ্যযুগের দীর্ঘ সময় ধরে সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের যে বিবর্তন চৈতন্যদেবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, তা লালনের জীবনচর্যায় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। কিন্তু প্রবহমান ঐতিহ্যের নবায়ন ঘটাতে চৈতন্যদেবকে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দেখা দিয়েছে জীবন সংশয়। লালনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সামাজিক জাত-ধর্মের রক্ষণশীলতা, গোড়ামি এবং ইসলামি শরিয়তি ব্যবস্থার কড়াকড়ি লালনকে নানারকম জটিল আবর্তের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। ফলে একদিকে সাধনমার্গ, অন্যদিকে জীবনদর্শন — দুইভাবেই লালন চৈতন্যদেব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও লালন চৈতন্যদেব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

লৌকিক গণধর্মের প্রতি আস্থাশীল হয়ে দুজনেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সমাজ-মননে মানবীয় প্রেমকেও মান্যতা দিয়েছিলেন মহাপ্রভু। চুয়া-চন্দন তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। চন্দন বেনের প্রণয়-ঘনিষ্ঠ চুয়াকে ভোগ করার জন্য জোর-জবরদস্তি ধরে নিয়ে গিয়েছিল পাষণ্ড মাধাই। মাধাই তাকে বিয়ে করবে বলে তার চ্যালা-চামুন্ডাদের দিয়ে নদীতে স্নান করতে পাঠিয়েছিল। নিমাই পণ্ডিতের পরামর্শে চন্দন বেনে স্নানের ঘাটে ছড়িয়ে দিয়েছিল প্রচুর মুক্তো। মাধাইয়ের চ্যালারা যখন সেই মুক্তো কুড়োতে ব্যস্ত, তখন চুয়া আর চন্দন সাঁতার কেটে মাঝ-নদীতে পৌঁছে গেল। সেখানে নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন নিমাই পণ্ডিত। তাদের দুজনকে নৌকায় তুলে নিয়ে অদূরে অপেক্ষারত চন্দন বেনের বজরায় পৌঁছে দিয়ে তিনি ফিরে এলেন। লালনের ক্ষেত্রেও এই সমাজ-মননের দৃষ্টান্ত রয়েছে। লালনের আখড়ার কিছুটা দূরে নদীর ধারে ছিল একটি শ্মশান। একদিন শ্মশান থেকে ভেসে আসা আর্ত-চিৎকার শুনে, লালন তার লোক-লস্কর নিয়ে শ্মশানে গিয়ে দেখেন, একজন সদ্য-বিধবাকে জোর করে তার স্বামীর চিতায় তুলে দিচ্ছে শ্মশান-যাত্রীরা। লালন সেই মহিলাকে উদ্ধার করে এনে তার আখড়াতেই আশ্রয় দিয়েছিলেন।

শুধু চৈতন্যদেব কেন, — উদার মানবতাবাদী বহু মরমি সাধকদের মত ও পথ লালন অনুসরণ করেছেন। একসময় এ দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দুষ্ট ক্ষতের মতো জেঁকে বসেছিল। ধর্মকে আশ্রয় করে কুপ্রথা ও কুসংস্কার সমাজজীবনে শক্ত ভিত তৈরি করে নিয়েছিল। মধ্যযুগের মরমি সাধক ও ধর্মসংস্কারকেরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। কিন্তু সেগুলো সমূলে উচ্ছেদ সম্ভব হয়নি। জাতবিচার সম্পর্কে সাধক তুলসীদাসের মন্তব্য প্রাণিধানযোগ্য- ‘লোকেরা উত্তম-অধম বর্ণবিচার করে জাতির গর্ব করে। কিন্তু পরমেশ্বর ভজন বিনা চারটি জাতিই চামার হিসেবে গণ্য হয়।’ সাধক পল্টুও এই মতের সমর্থক। তিনি বলেছেন —

পল্টু, উঁচি জাতকা, মত কোঈ কর অহংকরা।
সাহেবকা দরবার মে, কেবল ভক্তি পেয়ার।।

উদার মানবতাবাদের দিক থেকে লালন এদেরই যোগ্য উত্তরসূরি। তাই তিনি বলতে পেরেছেন — ‘ভক্ত কবির জেতে জোলা / প্রেমভক্তিতে মাতোয়ারা / ধরেছে সে ব্রজে বালা / দিয়ে সর্বস্ব ধন তাই।।’

চৈতন্যদেব ও লালন দুজনেই প্রেমকেই সাধনার মুল ভিত্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করেছিলেন। প্রেম ও ভক্তির মেলবন্ধনই সারস্বত সাধনাকে ঋদ্ধ করতে পারে। প্লেটোই প্রথম ‘প্রেম’ শব্দের দার্শনিক ব্যাখ্যা দেন। গ্রিক দার্শনিক হেসিওড বস্তু হিসেবে প্রেমকে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ‘আত্মা’ একটি সত্তা। সে সত্তা তিনটি জগতে বিচরণ করে। ভাবজগৎ, ধারণার জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ। সুন্দর বস্তুর সাক্ষাতে সে আত্মা জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। আর প্রেম ক্রমশ সুন্দর বস্তু থেকে সুন্দর আত্মার দিকে ধাবিত হয়। প্রত্যেকটি আত্মার মধ্যে প্রেমের পূর্ণতা অর্জন বা পরম কল্যাণ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বর্তমান। এই প্রেমের পূর্ণতা অর্জনের জন্যই যমুনা-কূলে কদম্বের ডালে বেজে উঠেছে কৃষ্ণের বাঁশি। রাধিকা কুল-মান সব বাহ্যজ্ঞান করে হয়েছেন

বিবাগী। রাধারূপী মানবাত্মা শ্রীকৃষ্ণরূপী পরমাত্মার প্রগাঢ় প্রেমাকর্ষণে ঘর ছেড়েছেন। লালনের মতে, মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এই মিলনই ঐশী প্রেমের মূলকথা। এই প্রেমেরই আকুতি তাঁর গানে ধরা পড়েছে গভীর দ্যোতনায় —

মিলন হবে কতদিনে,
আমার মনের মানুষের সনে।

এই ঐশী প্রেম বা ঐশ্বরিক প্রেমের জন্যই মনসুর 'হাল্লাজ আনাল হক' বাণী উচ্চারণ করে শূলে চড়েন।

কাম থেকে নিষ্কামী হয়ে ঐশী প্রেমে উন্নীত হওয়াই সাধকের মূল লক্ষ্য। চৈতন্যদেব এই প্রেমেই বিভোর ছিলেন। বিশেষ করে জীবনের শেষ কয়েকটি বছর যে ভাবাবেশ তাঁকে আকৃষ্ট করে রেখেছিল তা ঐশী প্রেমের চূড়ান্ত রূপ বলেই ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক দর্শনের ভিত্তিভূমি পৃথিবীর প্রাচীন গ্রন্থ বেদে ঐশী প্রেমের নিদর্শন নেই অর্থাৎ প্রেম-পিরিতির উপাসনা নেই এবং মুনি ঋষিরাও প্রেমিক নন বলে লালনের ধারণা।

'ধ্যানী জ্ঞানী মুনিজনা
প্রেমের খাতায় সই পড়েনা
প্রেম-পিরিতির উপাসনা
কোনো বেদে নাই।'

পরাতাত্ত্বিক প্রেমের কথা বেদে নেই। পারস্পরিক সহমর্মিতা, সখ্য, সঙ্ঘবদ্ধতার কথা থাকলেও ঐশী প্রেমের গূঢ় তত্ত্ব স্থানলাভ করেনি। কিন্তু 'কাম' শব্দটির উল্লেখ আছে। 'প্রেম' সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য কোনো আলোচনা নেই। লালনের মতে 'কাম' অমাবস্যার প্রতীক এবং 'প্রেম' পূর্ণিমার প্রতীক। প্রেমের সঙ্গে কামের অপরিহার্যতা সূচিত হয় পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক যৌনসম্বন্ধ স্থাপনের মধ্য দিয়ে। অমাবস্যা-পূর্ণিমার মিলনের প্রতীকে কল্পিত কাম ও প্রেমের সৌহার্দ্য - দ্যোতনায় ব্যঞ্জিত হয়েছে লালনের গান। লালন-দর্শনে দেহ-মিলন সাধনার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু দেহগত প্রেম থেকে দেহাতীত প্রেমে পৌঁছানোর স্বীকৃতিই ঐশী প্রেমের সোপান তৈরি করে দিয়েছে।

'প্রেম-পিরিতি পরম পতি
কাম-গুরু হয় নিজপতি
কাম বিনে প্রেম পায় কী গতি
কয় ফকির লালন।।'

বৈষ্ণব ধর্মেও নারী-পুরুষের সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়নি। তবে তা অতি অবশ্যই কামোত্তীর্ণ হতে হবে।

পরমাত্মার রমণ-কারণ বা কাম-সাধনে শক্তির উৎপত্তি ঘটে। এই ধারণা অনুসারে পরমাত্মার মধ্যে একটি সত্তা পুরুষ — সে ভোক্তা। একটি সত্তা স্ত্রী — সে ভোগ্য। অপরটি উভয়ের মিলনজাত একীভুত আনন্দময় সত্তা। এই আনন্দময় সত্তা থেকে জীবের উৎপত্তি। এই আনন্দই

ব্রহ্ম। পরমানন্দময় সত্তার এই তত্ত্ব বা কল্পনা বৈষ্ণবতত্ত্ব ও লালনের বাউল-দর্শনের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। সহজ-প্রেম, সহজ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ প্রভৃতি নামে উল্লেখিত হলেও আনন্দ-স্বরূপের সাথে মিলনকে বিশেষ দৃষ্টিকোণের বিচারে পরাতাত্ত্বিক প্রেমের দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বাংলার বৈষ্ণব-দর্শন, বাউল-দর্শন ও সুফি-প্রেমতত্ত্বের প্রভাবে প্রেমতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সাধকের একান্ত গূঢ় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বেদান্ত দর্শনে এ তত্ত্বের গূঢ়ার্থ প্রকাশ পায়নি। ঐশ্বরিক প্রেমের আনন্দস্বরূপ দেহাতীত প্রেমের অপার্থিব মার্গে পৌঁছায়নি।

'বেদে কী তার মর্ম জানে
যে রূপে সাঁইর লীলা-খেলা
আছে এই দেহ-ভুবনে।।
পঞ্চতত্ত্ব বেদের বিচার
পণ্ডিতেরা করেন প্রচার
মানুষ তত্ত্ব সাধনার সার
বেদ ছাড়া বৈরাগ্য মানে।।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে প্রেম দেহাতীত বস্তু। পরমপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনী শক্তি থেকে নবোদ্ভিন্নযৌবনা রাধিকাকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁর সঙ্গে লীলা সংঘটিত করে আনন্দরস আস্বাদন করেন। মাধুর্য প্রেম উপলব্ধি করেন। মাধুর্য প্রেম শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য — প্রেমের সর্বশেষ পরিণতি। এই মাধুর্য-প্রেম এবং রাধিকা একসূত্রে গ্রথিত। লালন এই রাধাকে 'হ্লাদিনী-সার' বলে উল্লেখ করেছেন। রাধাপ্রেম বা গোপীপ্রেম কামনাহীন, কলুষহীন, অপার্থিব প্রেম। এই প্রেম আস্বাদনের জন্যই প্রেম-অবতার শ্রীচৈতন্য গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে সাজুয্য মুক্তিতে বিশ্বাস করে, লালন তার মধ্যে অসারতা খুঁজে পেয়েছেন। তিনি সাজুয্য-মুক্তি পেলেও সে মানুষের ঠকবার ভয় আছে। আসলে 'সরল প্রেমের প্রেমিক হলে ডুবতে হবে স্বরূপ-রূপ আশ্রয়।' 'আন্দাজী প্রেম', মরণ-ফাঁদ তৈরি করে, দুষ্ট লালসা-দোষে পাতালগামী করে। তাই তিনি কামনদীতে ঝাঁপ দিতে নিষেধ করেন।

'দম কষে তুই পড়না ক্ষ্যাপা প্রেমের পুকুরে।
ধরবি যদি মীন-মকরা কাম রেখে দে তফাতে।।
গহীন জলে বাস করে মীন
গুরু বলে ছড়াতেছে ঝিম
যে চিনেছে সেই জলের হিম
মীন ধরা দেয় তার হাতে।।

লালনের মতে, পরমতত্ত্ব একটি প্রেম পদার্থ। বিভিন্ন নামে তা অভিহিত। প্রেমরস, প্রেমামৃতবারি, প্রেমসিন্ধু, প্রেমজন, প্রেমের গাছ — এইরকম নানা অভিধায় লালন তাকে ব্যবহার করেছেন। সমস্ত বস্তু, সত্তা ও জীবজগতের মূলে রয়েছে এই প্রেম-পদার্থ। পরমসত্তারূপী প্রেম-পদার্থ যেন একটা গাছ। ওই গাছ থেকেই জগতের উৎপত্তি, জীবন ও প্রাণের আবির্ভাব।

লালনের মতে, প্রেম-সিন্ধু থেকে যে বিশ্বের উৎপত্তি তা আসলে 'নুর'। 'নুরেতে কুল-আলম পয়দা।' 'নুর'ই বিবর্তিত হয়ে 'পানিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই পানির আকার বিস্তৃত হয়ে 'নুরের সিন্ধু'তে পরিণত হয়েছে। সেই পানির পরিচিতি হয়েছে 'প্রেম পানি' নামে। সেই পানিতেই প্রেমময়ের জগৎ সৃষ্টি হয়েছে —

সেই প্রেমময়ের প্রেমটি অতি চমৎকার।
প্রেমে অধম পাপী হয় উদ্ধার

প্রেমের বানিয়ে তরী দুনিয়া মাঝে
দিলেন পাঠাইয়ে পাপীর লাগিয়ে
মানুষ চাপিলে তারে অনাসেতে
স্বর্গেতে পায় অধিকার।।

এ তো চৈতন্যদেবের দিব্য জীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফসল। পাপী-তাপী উদ্ধারণের প্রেম-বারি সিঞ্চনের যে ধারার প্রবর্তন মহাপ্রভু করেছিলেন, লালন তাকেই শিরোধার্য করেছেন। প্রেমময়ের প্রেম অতি চমৎকার। তার প্রেম দিয়েই তিনি তরি সৃজন করেন। সেই তরিতে জীবনকে ধারণ করে মানুষকে সেই রসামৃতলোকে যাত্রা শুরুর ব্যবস্থা তিনিই করেন। লালন বলেন, 'জগৎ আলো করেছে সই ফুটে প্রেমের কলি।' ঐশ্বরিক প্রেম জীবনকে অস্তিত্বের নিম্নস্তর থেকে উপরের দিকে নিয়ে যায়।

লালনের গানে ঐশী প্রেমের যে ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে তা মূলত জীবনকে ক্রমাগত ঊর্ধ্বস্তরে উন্নীত করে, পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে এগিয় দেয়। প্লেটো, প্লটিনাস, ইবনে সিনা, ইবনুল আরাবি, রুমি প্রমুখ দার্শনিকদের পরাতাত্ত্বিক প্রেমের বিশ্বজনীনতার সঙ্গে লালনের প্রেমতত্ত্বের সাজুয্য রয়েছে। সৃজনশীল বিশ্বতাত্ত্বিক নীতি জীবনকে গতি দান করে, উচ্চতর্ম আদর্শের দিকে নিয়ে যায়। পরমগুরুর সঙ্গে মিলনের পথ তৈরি করে দেয়। প্রেম সাগরের অথৈ জলে ডুবে 'প্রেমিক মরা' কেবল 'আল্লা-নবী বুলি' বলে — মৃত্যুকে ভয় করে না। ঐশ্বরিক প্রেমের সন্ধান যে পায়, মৃত্যুর মধ্য দিয়েও উন্নত জগতে পৌঁছাতে সক্ষম। তাই লালন মৃত্যুভয়ে ভীত নন। ঐশী প্রেম তাঁকে মৃত্যুঞ্জয় হওয়ার ঘনিষ্ঠ সোপান চিনিয়ে দিয়েছে।

'প্রেমের রাজ্যে কত সুখ যে, তাহা বলা যায় না।
যে এসেছে সেই মজেছে, অন্য রাজ্যে যেতে চায় না।।'
মহামারী এলে দেশে
লোকে মরে মহাত্রাসে
আমি কিন্তু হেসে হেসে
করি কেবল নাম সাধনা।।'

এই নামসাধনার প্রবর্তক মহাপ্রভু। জীবের মোক্ষমুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হিসেবে তিনি নাম-সংকীর্তনকেই শিরোধার্য করেছিলেন।

বাউল সাধকদের মধ্যে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় প্রেম ধর্মের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। বাংলার বাউল সাধকদের 'রসিক বৈষ্ণব' 'রসিক পন্থী' 'রাগানুগা-পন্থী', 'বৈষ্ণব নামেও অভিহিত করা হয়। এটি বিশেষ ক্রিয়ামূলক নয়। আর বাউলদের সাধনা নির্দিষ্ট যোগমূলক ক্রিয়া। মুল সাধনতত্ত্বে বাউল ও সুফিদের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে।

ভারতবর্ষে সুফিদের আগমনের পর এক শ্রেণির ভগবৎ প্রেমিক সাম্প্রদায়িক ধর্মগণ্ডির বহির্ভূত, আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণ মুক্ত, 'সহজ পথ'-এর সাধক সম্প্রদায় উদ্ভুত হয়েছিল। তারাই উত্তর ভারতীয় সন্ত সাধক। অনুমান করা যায়, বাংলাতেও ওইরূপ মুসলমান ও হিন্দু শ্রেণির এইসব সাধক বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করে বাংলার চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়। তারপরই তন্ত্রের দেশ বাংলায় তন্ত্র প্রভাবান্বিত বর্তমান বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এবং পূর্বোক্ত শ্রেণির ভগবৎ-প্রেমিক বিশুদ্ধ বাউল সম্প্রদায় ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়।

চর্যাগীতির সঙ্গে বাউলের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। চর্যার রূপকাশ্রিত তত্ত্ব বাউলের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। চর্যাগানের সঙ্গে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত, তার অনুরূপ যন্ত্র বর্তমান বাউল গানের সঙ্গে বাজানো হয়। রচনার দিক থেকে বাউল এবং চর্যাপদের পার্থক্য থাকলেও ভাবের দিক থেকে দুটি একই প্রকার। সহজযানদের গান ক্রমে সহজিয়াদের এবং তারও পরে বাউলদের গানরূপে পরিবর্তিত হয়ে আজ এক বাউল পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। আনুমানিক ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে থেকে ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ পৌনে তিনশো বছরব্যাপী বাউলের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতির অবস্থান কাল।

"চৈতন্যদেবের (১৪৮৩ - ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) মৃত্যুর পর, গোস্বামীদের গৌড়ীয় ধর্মমত প্রচার এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত প্রকাশের পর আনুমানিক ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ তক আমরা বাউল নামে ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব কল্পনা করিতে পারি, যাহাদের ধর্মমতের তত্ত্ব ও দর্শন রাধাকৃষ্ণের বা প্রকৃতি-পুরুষের যুগলতত্ত্ব, উপনিষদ ও সুফী ধর্মের পরমাত্মবাদ এবং ব্যক্তিগত ভগবানের মিশ্রণ, — সাধনাংশটি প্রধানত বৌদ্ধ সহজিয়াদের মতের বা রূপান্তরিত বৈষ্ণব সহজিয়া মতের।" (বাংলার বাউল ও বাউলগান — উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)। বাউলের উৎপত্তির সময়কাল নিয়ে নানামত থাকলেও মোটামুটিভাবে বলা যায়, সতেরো শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকেই বাউল মতের উন্মেষ। মদিনার মাধব বিবি ও আউলচাঁদই এই মতের প্রবর্তক বলে অনেকের ধারণা। মাধববিবির শিষ্য নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্রই বাউলমত জনপ্রিয় করেন। তারপর উনিশ শতকে লালন ফকিরের (১৭৭৪-১৮৯০ খ্রিঃ) সাধনা ও সৃষ্টির মধ্যেই এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।

'রসিক' শব্দটি একটি বিশিষ্ট অর্থে বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা পূর্ণ প্রেম ও মাধুর্য রসের সাধনা দুরুহ সহজিয়া-সাধনে সিদ্ধসাধকই প্রকৃত রসিক।

'রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহ রসিক নয়,
ভাবিয়া গনিয়া বুঝিয়া দেখিলে

কোটিতে গোটিক হয়।' (রাগাত্মিকাপদ)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীগণ যে চৈতন্যদেবকে রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত মূর্তি বলে প্রচার করেছেন, বাউলরা তাদের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের মূল ব্যঞ্জনা সেখান থেকেই গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলিত অদ্বয়তত্ত্বকে বাউলরা 'গুরুতত্ত্ব' বা 'চৈতন্যতত্ত্ব' আখ্যায় অভিহিত করে। মুসলিম ফকিরদের মধ্যেও রাধা-কৃষ্ণ ও চৈতন্যতত্ত্ব যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। যুগল-ভজন তাদেরও মূল সাধনা। চৈতন্যদেবকে এরা 'মহাগুরু' বলে প্রণিপাত করে। তবে সূফিধর্মের প্রভাব থেকে এরা মুক্ত হতে পারেনি।

আল্লাহই মূলতত্ত্ব। মানুষকে তিনি নিজের আকৃতি, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরি করেছেন। মানুষের মধ্য দিয়েই তার আত্মপ্রকাশ। সেই আল্লাহ মানুষের 'নিগুণ শহরে' বাস করেন। চৈতন্যদেবের মতো তিনিও আমাদের মহাপ্রভু। আবার এই আল্লারূপী আল্লাহই 'অধরকালা', 'অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণনিধি' 'অধরচাঁদ' 'অধরমানুষ' ও 'মনের মানুষ'। মুসলমান বাউলদের রচনায় তত্ত্ব ও দর্শনের দিক দিয়ে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের একটা অপূর্ব সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

এই আত্মারূপী আল্লাহ বা অধরকালাকে উপলব্ধি করতে হলে যে সাধন পদ্ধতি প্রয়োজন, তাতে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির সাধকই এক পথাবলম্বী। প্রকৃতি-পুরুষের মিথুন-তত্ত্বের মধ্য দিয়েই তাদের সাধনা। সুফি ধর্মমতে মানবাত্মাকে আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে হলে, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে হলে যে অবস্থাগুলি অতিক্রম করতে হয়, সেই 'নাছুক', 'লাহুত', 'জবরুত', 'মালকুত', 'হাউত' প্রভৃতির প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ তাদের গানের মাঝে দেখা যায়। সুফিদের সাধনা মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রেমের সাধনা। প্রেমের তীব্রতায় পরমাত্মা ও জীবাত্মার এক প্রকার অভেদ জ্ঞানই তাদের সাধনার মূল ভিত্তি। সুফিদর্শন জ্ঞানমূলক ও বিশেষভাবে অনুভূতিমূলক সাধনা। সাধনার অনুভূতি ও আবেগের তীব্রতায় 'ফানা' অবস্থান প্রাপ্তির সাধনা।

চৈতন্যদেব ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীতকে প্রচারের বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। খোল-করতাল সহযোগে হরিনামের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আত্মহারা, আপনভোলা বাউলের সব বৈশিষ্ট্যই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অধ্যাপক মহম্মদ আবু তালিব চৈতন্যদেবকে বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের আদিগুরু বলে অভিহিত করেছেন। এই মন্তব্য সম্পর্কে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও লালন যে চৈতন্যদেব দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সে বিষয়টি অনস্বীকার্য। কারণ পূর্বসূরীর প্রভাব উত্তরসূরীর ওপর পড়বেই। লালনের গানে বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্তপদাবলীর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। যতদূর মনে হয়, নবদ্বীপ বাসকালে তিনি বৈষ্ণব-দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়, নানা তীর্থে লোকমেলায় দিন অতিবাহিত করতে করতে তিনি এক সময় নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হন। নবদ্বীপে তখন বহু বৈষ্ণব-আশ্রম। বৈষ্ণবীয়-তত্ত্বের চর্চা চলছে নানাভাবে। বহু সাধক-সাধিকা আশ্রমে বসবাস করেন। লালন পদ্মাবতী নামে এক বৈষ্ণবীর আশ্রমে আশ্রয় নেন। পদ্মাবতীকে তিনি 'মা' বলে সম্বোধন

করতেন। পদ্মাবতী লালনকে খুব স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। লালন পদ্মাবতীর কাছ থেকে নানা তত্ত্বোপদেশ শুনতেন এবং সেগুলি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন। এই সময় পদাবলি কীর্তন ও শাক্তগীতি দ্বারা লালন প্রভাবিত হন। এছাড়াও প্রথমজীবনে তিনি হরিশপুরে পদাবলি কীর্তনের রসাস্বাদন করতেন প্রাণভরে। ধুয়োগান, জারিগানও তাকে আকর্ষণ করত। তিনি বয়াতি হয়ে গ্রামে গ্রামে গান গেয়েও বেড়িয়েছেন। তবে কৃষ্ণপ্রেমে, চৈতন্যপ্রেমে তিনি যে বিভোর ছিলেন তাঁর বহু গানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। লালন-মানসে কৃষ্ণপ্রেম বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। চৈতন্য-প্রীতিও লালন-মানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। চৈতন্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন —

'যদি গৌরচাঁদকে পাই।
গেল গেল এ ছার কুল তাতে ক্ষতি নাই।।
কি ছার কুলের গৌরব করি
অকুলের কুল গৌর হরি
এ ভব-তরঙ্গে তরী
গৌর গোঁসাই।।

ছিলাম কুলের কুল বালা
স্কন্ধে নিলাম আঁচলা-ঝোলা
লালন বলে গৌরবালা
আর কারে ডরাই।।

কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা দুই-ই ব্যাখ্যাত হয়েছে লালন-সঙ্গীতে। গৌরাঙ্গকে তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল অবতার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পদাবলির সুরও তিনি তাঁর গানে গ্রহণ করেছেন। 'ব্রজের সে ভাব কি সবাই জানে যে ভাবে শ্যাম বাঁধা আছে গোপীর মনে।।' — গানটিতে পদাবলি কীর্তনের সুর আশ্রয় করেছেন লালন।

চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা অবলম্বনে অনেকে নিত্য ও শাশ্বত সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। এই সাধনায় ব্রতী হয়ে বহু সাধক ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়েছিলেন এবং এক চিরায়ত সত্যকে প্রচার করারও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর জন্যই এই ত্যাগের বাণী প্রচার সম্ভব হয়েছিল। তিনি নদিয়ায় আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে শুধু নদিয়ায় নয় সারা বিশ্বকে মানবধর্মের মহান ব্রতে উজ্জীবিত করেছিলেন। লালন নদিয়াবাসীকে সৌভাগ্যবান বলেছেন —

ধন্য রে নদিয়াবাসী,
হেরিল গৌরাঙ্গ-শশী।

কিংবা,

নদেবাসীর ভাগ্য ভাল,
গৌর হেরে মুক্তি পেল।

এই মহান প্রেমিক-পুরুষ মহাভাবের ভাবুক। তাঁর প্রেমে মত্ত হয়ে নারী-পুরুষ ঘর-সংসার ত্যাগ করেছেন। লালনও গৌর-প্রভাবিত হয়ে গৌর-লীলা বিষয়ক বহু সঙ্গীত রচনা করেছেন।

'বাউল মতবাদ' বলতে মিথুনতত্ত্বভিত্তিক সাধনার একটি বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। আদি ভারতীয় যোগ ও তন্ত্র সাধনা 'যৌন যোগসাধনা' নামে পরিচিত। এটি মিথুনতত্ত্বেরই প্রতিরূপ। সুফি সাধকরা এ তত্ত্ব তাদের সাধনক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন। লালনও সুফি তত্ত্বকে আশ্রয় করেছেন। চৈতন্যদেব একটি গুহ্যসাধন-প্রণালী অবহিত ছিলেন। এটি মূলত পুরুষ-নারীর মিলন-জাত সাধনা। বৈষ্ণব সহজিয়া মতে একে 'পরকীয়া প্রেম' বলা হয়েছে। এ প্রেম মিথুনতত্ত্বেরই নামান্তর। অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, জীব গোস্বামী, রূপ-সনাতন প্রমুখ এ তত্ত্ব জানতেন। এই পরকীয়াতত্ত্ব প্রচারাভিলাসে চৈতন্যদেব নিজেই আউলচাঁদরূপে পুনরাবির্ভূত হন বলে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর বিশ্বাস প্রচলিত আছে। আউলচাঁদের পুত্র রাম শরণ। রাম শরণের পুত্র দুলাল চাঁদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আউল চাঁদ 'ফকির ঠাকুর' নামে খ্যাত ছিলেন। আউলচাঁদের শিষ্য মাধব বিবি এবং মাধব বিবির শিষ্য নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র পরকীয়া সাধনতত্ত্ব জনপ্রিয় করেন। এই তত্ত্ব বাউল তত্ত্ব বা বাউল সাধনা। এই তথ্য অনুসারে চৈতন্যদেবই প্রকৃতপক্ষে বাউলতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। ফকির লালন মহাপ্রভু সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা পরিত্যাগ করে নদিয়াতে তাঁর আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করেছেন অন্যভাবে —

কার ভাবে শ্যাম নদেয় এলো।
তাঁর ব্রজের ভাবে কি অসুসার ছিলো।।
গোলকেরই ভাব, ত্যজিয়ে সে ভাব
প্রভু ব্রজপুরে লয়েছিল যেহি ভাব
এবে নাহি তো সে ভাব
দেশি নতুন ভাব
এ ভাব বুঝিতে কঠিন হলো।।

কলিযুগের ভাব একি বিষম ভাব
নাহি ব্রতপূজা নাহি অন্য লাভ
ছিল দণ্ডীবেশ
দণ্ড কমণ্ডলু
নিতাই আবার তাহা ভেঙে দিলো।।

উহার ভাব জেনে ভাব নেওয়া হলো দায়
না জানি কখন কি ভাব উদয়
করলে তিনটি লীলা একা নদিয়ায়
লালন ভেবে দিশা নাহি পেলো।।

মহাপ্রভুর অন্তর্নিহিত ভাব-ভাবনা লালন বুঝতে পারেননি। কখন কীভাবে তিনি তার

লীলা প্রকাশ করেছেন তা বোঝা অত্যন্ত দুরূহ। তবে মানুষকে তিনি প্রেমে মাতোয়ারা করেছেন, সে বিষয়ে লালন নিশ্চিত। সাধন-ভজন ব্রতপূজা সব ছেড়ে শুধু প্রেমমাহাত্ম্যকেই তিনি প্রচারের মাধ্যম করে নিয়েছেন। তাঁর প্রেমাদর্শ অনুসরণ করেছেন লালন। তাই তিনি বলেছেন —

এনেছে এক নবীন গোরা
নতুন আইন নদিয়াতে।
বেদ-পুরান সব দিচ্ছে দুষে
সেই আইনের বিচার মতে।।
না করে সে জাতের বিচার
কেবল শুদ্ধ প্রেমের আচার
সত্য মিথ্যা দেখ প্রচার
সাঙ্গ-পাঙ্গ জাত-অজাতে।।
পেয়ে শুদ্ধ ঈশ্বর চরণা
তাই বলে সে বেদ মানে না
লালন কয় তার উপাসনা
কর্ দেখি মন, দোষ কি তাতে।।

বেদে-পুরাণের বিধিবদ্ধ রীতি চৈতন্যদেব মানেননি। পূজা-পাঠের সহবত তাঁর কাছে বাহ্য আচার ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে 'উপাসনা' বলতে গৌর-প্রেমের আদর্শ অনুসরণ বোঝানো হয়েছে। গৌরাঙ্গকে পূজা কিংবা আরাধনা করার কথা এখানে মুখ্য নয়। এই উপাসনা মনতুষ্টি সাধন-প্রয়াস বলেই মনে হয়।

অবতারদের মধ্যে ব্রহ্মের অংশকলা প্রকাশিত হয়। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রমুখ সে পরম ব্রহ্মের অবতার রূপেই নানাভাবে তাঁদের লীলা প্রকাশ করেছেন। চিরায়ত ভাবনা সে লীলার মধ্যে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, ভৌগোলিক বা অর্থনৈতিক ব্যবধান কোনো কিছুই গ্রাহ্য নয়। চৈতন্যদেবের সেই শ্বাশত ভাবনাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন লালন। এককথায় লালন চৈতন্যদেবের গুণমুগ্ধ বলেই তাঁর প্রভাবে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।